বুয়েটে দুঃখজনক ঘটনা ও ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক

স্থপতি ইয়াফেস ওসমান

আমরা পঁয়ষট্টি সালে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলাম। তখন এটাকে ডক্টর রশীদের পাঠশালা বলা হত। তবে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কটা গুরু-শিষ্যই ছিল। ছাত্ররা শিক্ষকদের ভয় করতো, তবু কোথায় যেন একটা গভীর সম্পর্ক কাজ করে গেছে। তৎকালীন উপাচার্য ডক্টর রশীদের সময়ও ছাত্ররা দাবি নিয়ে আন্দোলন করেছে, মশাল মিছিলও হয়েছে; কিন্তু শ্রদ্ধায় চিড় ধরেনি এতটুকু। অনেক রাশভারি জাঁদরেল শিক্ষকই তখন ছিলেন। ডক্টর আলীমুল্লাহ খান, ডক্টর জব্বার, ডক্টর ভি জি দেশা, ডক্টর হাসনাত স্যার যাঁদের দেখলে ছাত্ররা দৃষ্টি এড়াতে চাইতো। হাসনাত স্যার তো ক্লাসে ডাস্টার দিয়ে মাথা ঠুকে দিতেন; কিন্তু পিতাপুত্রের বিশ্বাসে কোনদিন কোন মলিনতা ছিল না। পদার্থ বিজ্ঞানের শিক্ষক কামিনী মোহন সাহা জীবনে কোনদিন তাঁর সাধারণ পোশাক পরিবর্তন করেননি, আর এগুলোই সেদিন আমাদের কাছে সবচেয়ে গভীর সম্পর্ক অনুভূতির বস্তু ছিল। প্রাক্তন উপাচার্য ডক্টর শাহজাহান তখন শেরে বাংলা হলের প্রোভোস্ট, কি কারণে যেন ছাত্ররা উত্তেজিত হয়ে ওঁর গাড়ি ভাঙল; কিন্তু সম্পর্ক তো ভাঙল না। ছাত্রদের যথার্থ দাবির কারণে স্থাপত্য অনুষদের ডিনকে বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যাগ করতে হলো; কিন্তু সেদিন সকলে এই বোধই ধারণ করেছিলেন, পরিবারে কেউ যদি সময় দিয়ে তাঁর দায়িত্ব পালন করতে না পারে তাহলে তাঁর সরে দাঁড়ানোই মঙ্গল। আমাদের সময়ে আইনের কড়াকড়ি আরও বেশি ছিল। অন্যায় হলে গুরু শাস্তিই হতো; কিন্তু কোন ছাত্রের মনেই তো এটা গুরুভার হয়ে দেখা দেয়নি। বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের পারিপার্শ্বিকতায় এ শাস্তিও প্রাপ্তি বলেই আমরা মনে করে এসেছি। তাহলে বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের চলার পথে কোথাও কি তাল কেটে গেছে? আজ যাঁরা প্রবীণ শিক্ষক তাঁদের অনেকেই তখনকার শিক্ষকদের খুব কাছ থেকে দেখেছেন। তাহলে কি ভাবব তাদের অনুভবে কোন খাদ রয়ে গেছে? নাহলে এমনটা হবে কেন? দেশের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের বেলায় ছাত্র ভর্তি নিয়ে যেসব কাণ্ড চলে এখানে তো সে সব নেই, কেবল মেধাবী ছাত্ররাই প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে সুযোগ পায়। এখানে কে কার ছেলে, বাবার সামাজিক প্রতিপত্তি কত, তা দিয়ে ছাত্রের আচরণ বিচার হয় না। তাহলে কি এ পরিবারের সম্পর্কের গভীর সুর বেসুরো বাজতে শুরু করেছে? আজ শ্রদ্ধেয় শিক্ষকরা যে সমাজের কাছে নিজেদের দুঃখ তুলে ধরলেন, সে সমাজ কি তাদের দুঃখ ভাগ করে নেয়ার মানসিকতা ধারণ করে? যদি সেটা করতো তাহলে অন্য কোথাও তাল কেটে গেলে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাল দিকগুলোর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলতে শুনতাম ওদের মতো হও।

উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান আর '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবময় ইতিহাস আছে। উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংগঠনগুলো ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের আহসানউল্লাহ হলে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ কর্তৃক ১১ দফা স্বাক্ষরিত হয়। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শেরে বাংলা হলের ছাত্র আসাদ পুলিশের গুলিতে পঙ্গুত্ববরণ করে। মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতিপর্বে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা গোপনে অস্ত্র চালনা শিক্ষা করে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের আহসানউল্লাহ হলের ছাত্র সালাউদ্দিন সবুজের বুকে রক্তিম বৃত্তের মাঝে বাংলাদেশের সোনালী মানচিত্রখচিত প্রথম পতাকা তৈরি করে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা পাক জান্তার রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে কায়েদে আযম হলের নাম মুছে ফেলে শহীদ তিতুমীর হল আর লিয়াকত হলের নাম মুছে দিয়ে শহীদ সোহরাওয়ার্দী হল রেখেছিল। '৭০ সালে নভেম্বরে এ দেশের উপকূলবর্তী অঞ্চল জুড়ে সর্বনাশা সাইক্লোন আর জলোচ্ছ্বাসে লাখ লাখ মানুষ প্রাণ হারায়। আর বেঁচে থাকা দুঃখী মানুষের অবর্ণনীয় দুঃখ লাঘবে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষকরা ত্রাণের কাজে সুদূর মনপুরা পর্যন্ত গিয়েছিল। '৭১ সালে ২৫শে মার্চ পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগে জনৈক শ্রদ্ধেয় প্রবীণ শিক্ষক প্রাণের ভয় উপেক্ষা করে সন্ধ্যায় বিভাগীয় ল্যাবরেটরি থেকে গোপনে পারদের জার আমাদের হাতে তুলে দিতে প্রস্তুত হয়ে এসেছিলেন। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের তড়িত বিভাগের শিক্ষক ডক্টর নুরুলউল্লাহ জীবন বাজি রেখে ২৬শে মার্চ জগন্নাথ হলের মাঠে পাকবাহিনীর নরকীয় গণহত্যার ভিডিও তুলে রাখেন, যা মুক্তিযুদ্ধ সংগঠনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রদর্শিত হয়। '৭১ সালে ১৪ই ডিসেম্বর বিকেলে জীর্ণ পোশাকে আমাদের গেরিলা দলটি মেডিক্যাল কলেজের পাশ দিয়ে যখন প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেছিল তখন ডক্টর জহুরুল হক স্যার দৌড়ে এসে বুকে জড়িয়ে ধরে অঝরে কেঁদে ছিলেন। উনসত্তরের আন্দোলনে পঙ্গু ছাত্র আসাদ মুক্তিযুদ্ধে শাহাদাৎবরণ করে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক ছাত্র শহীদ হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধে বহু ছাত্রের গৌরবময় ভূমিকার কারণে বীরপ্রতীক, বীরবিক্রম উপাধিতে ভূষিত হয়েছে। আজকের প্রজন্মের ছাত্ররা এ গৌরবময় ইতিহাস জানে না। শিক্ষকরা এ ইতিহাসের কথা স্মরণ করিয়ে দেন না। এ ত্যাগের কথা বিশ্ববিদ্যালয় ভুলে যেতে বসেছে। আর, তাই আত্মকেন্দ্রিক মলিনতা আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরছে বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সদস্যদের। হয়তো-বা তাই শ্রদ্ধেয় শিক্ষকরা এ নবীন প্রাণগুলোকে গড়ে তোলার মাঝে আনন্দ অনুভব করেন না।

তবে কি বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সদস্যরা কেবল নিজেদের চাওয়া-পাওয়া নিয়েই বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, যার কারণে কল্যাণমুখী কাজটা, আসল সুরটাতে টান পড়ে গেছে? গত বছর শতাব্দীর প্রলয়ংকরী বন্যায় ত্রাণের কাজে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা উদয়াস্ত মানুষের সেবায় ত্রাণের কাজে নিরলস শ্রম দিয়েছে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাই কিছুদিন আগে ইউকসু নির্বাচনে সমাজকে গণতন্ত্র চর্চার সঠিকতা উপহার দিয়ে গেল। আবার এরাই কেন এমন একটা অসম্মান কাজের সাথে জড়িয়ে পড়লো?

সময় এসেছে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারকে ভাবতে হবে নিজেদের কথা আর গৌরবময় ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়েই তৈরি করতে হবে নতুন ইতিহাস। নিজেদের পরিবারের মঙ্গলময় অধ্যায় নির্মাণ করতে হবে, এ বেদনাদায়ক ঘটনাকে ধরেই। যেটা হবে দুঃখের মধ্য দিয়ে সুখময় ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার আন্তরিক প্রচেষ্টা। ভাবতে হবে ছাত্র-শিক্ষক কেউ কারো প্রতিপক্ষ নয়। একই পরিবারের দুটি সম্পর্ক মাত্র। এ দুই আছে বলেই বিশ্ববিদ্যালয় আছে। গৌরবময় ইতিহাস আছে। দেশে মঙ্গলময় ভবিষ্যৎ আছে।

দৈনিক বাংলা
তারিখ ... MAY 22 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩